Patna university

Department of Bengali

Subject- Bengali , CC-10, Unit-I

Teacher – Dr. Sagar Sarkar

Topic- History of Bengali literature(from1800- 1950)

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

আধুনিক যুগের অন্যতম সাহিত্যিক বাহন হল গদ্য। এই গদ্যের আবির্ভাব আধুনিক যুগ ছাড়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য আধুনিক যুগের আগে যে ছিল না তা নয় , কিন্তু তার প্রমাণ ছিল বিচ্ছিন্নভাবে – দু – একটি চিঠিপত্রে দলিল দস্তাবেজে । আধুনিক বাংলা গদ্য ইউরোপীয় সংসর্গের ফল। আধুনিক জীবনের যুক্তিবোধ, ব্যবহারিক জীবনের বাস্তবতা বোধ প্রকাশের মাধ্যমে হিসাবে গদ্যের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আধুনিক কাল ও তার বৈচিত্র্য জটিল জীবনযাত্রা বাংলা গদ্যের উদ্ভব কে ত্বরান্বিত করেছিল।

বাংলা গদ্যের সৃষ্টি, মুদ্রা যন্ত্রের মাধ্যমে তার প্রকাশ, পাঠ্যপুস্তক রচনা – প্রভৃতি সকল বিষয়ে অবদান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজ বণিকদের। রাজ্যশাসনের তাগিদেই তারা এ দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন । তাই ১৭৪৩ সালের পর বাংলা গদ্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হলো ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে । কারণ ওই বছরই প্রকাশিত হয় হালহেড এর "এ গ্রামার অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ" এবং তা রচিত হয় এদেশীয় ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য । সংস্কৃতজ্ঞ হালহেড এই ব্যাকরনে কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ,ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর থেকে প্রচুর উদাহরণ দেওয়ায় সাধারণ বাঙালি তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন । ১৭৭৮–১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা গদ্যের নেপথ্য পর্ব । এই সময়ে অভিধান ব্যাকরণ শব্দ সংকলন প্রণয়নের দ্বারা বাংলা গদ্যের ভাষার ভিত্তি ভিত্তি দৃঢ় বদ্ধ হয়। এই নেপথ্য পর্বে হালহেড ছাড়া জোনাথান ডানকানের এন. বি পিটস , জন মিলার প্রমূখ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় " লোকের মুখে মুখে প্রচলিত বিশৃংখল বাংলা ভাষাকে তাহারি ব্যাকরণ অভিধান গণ্ডির মধ্যে বাঁধিয়া সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।" তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ব্যাকরণ অভিধান ও শব্দকোষের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে । ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেই ভিত্তিভূমির উপর সৌধ নির্মান কাজ শুরু হয় বহু ব্যক্তির আয়াস লব্ধ ঐকান্তিক প্রয়াসে। এই গদ্য সৃষ্টির ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস কে প্রমথ চৌধুরী সূত্র অনুসারে মূল্যায়িত করেছেন এইভাবে " ইংরেজরা ভারতে আসিল অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত কাব্যের স্থান অর্থাৎ বিচারমূলক চিন্তা দখল করল এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব হলো"। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের সৃষ্টি বিবর্তনের পথ উন্নতির পথে পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যাক্তি ও সাময়িক পত্রের অবদান ঐতিহাসিক প্রামানিক সত্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষের মুখের ভাষা ছিল গদ্য কিন্তু লিখত পদ্যে। এর কারণ বাঙালি

তখন পদ্য সাহিত্য চর্চা করতে শুধু স্বচ্ছন্দ বোধ করত না তাদের ধারণা ছিল লেখার ভাষা গদ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। গদ্যছন্দ যে আছে তা তারা অনুভব করতে না পেরে ছন্দময় পদ্ধতি সাহিত্যের বাহন করে তুলেছিল ।কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত " কিংবা কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী অথবা কবিকঙ্কন এর ভাষা এই তার প্রমান। আধুনিক যুগের সাহিত্যের যে বিচিত্র সাজসজ্জা মধ্যযুগের ছিলনা তাই সীমিত চর্চা পদ্যে কবার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সময় থাকলে মানুষ পদ্যে কথা কইতে পারে লিখতে পারে কিন্তু আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও বাস্তবতাকে রূপ দিতে গেলে পদ্ম গদ্য ছাড়া উপায় নেই। তাই বাংলা গদ্যের উদ্ভব এই সময় থেকেই শুরু হয়।

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার ও আধুনিক যুগের গদ্য উদ্ভবের অন্যতম। কারণ মধ্যযুগের মানুষ পুঁথি আশ্রয়ী পদ্য শুনে মনে রাখত। কিন্তু ছাপাখানার যুগের সেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার টি আরও সহজে হওয়ার পথ পেল। অর্থাৎ পুঁথির জায়গায় ছাপাখানা প্রসারে গদ্য রচনা পথকে সুগম করেছিল।

পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাব্য সাহিত্য মধ্য যুগে মানুষকে যতটা তৃপ্তি ও আনন্দ দিয়েছিলো ছন্দের মাধুর্য লালিত্য মানুষকে যেভাবে আকর্ষণ করতো সেই আকর্ষণের কারণে চিরাচরিত ঐতিহ্য ভেঙে গদ্যের ভিত প্রস্তুত হতে আর দেরী হইল না।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নানা ধরনের আন্দোলন ও সংস্কার প্রক্রিয়া এবং মিশনারীদের খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার গদ্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের পথ ত্বরান্বিত করে।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন "এই গদ্যের উদ্ভব হইয়াছে ঠিক অন্তরের প্রেরণা নয় বাইরের প্রভাবে বাঙালির মন ঠিক না হইলেও বাহিরের প্রয়োজন সাধনের জন্য উহাকে গদ্যচর্চা ব্রতী হইতে হইয়াছে। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কৃত্রিম বায়ু সঞ্চালনের ফলে স্বাভাবিক শ্বাস ক্রিয়া প্রবর্তিত হয় তেমনি কাব্যরস নিমজ্জিত বাঙালি লেখক এর ক্ষেত্রেও গদ্য রচনা আরোপিত কর্তব্যের চাপ ক্রমশ স্বভাব কুশলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় পরিণত হইয়াছে" ।

<u>বাংলা গদ্য চর্চার উন্মেষ পর্বের উদ্দেশ্য-</u>

বাংলা গদ্যের যখন উন্মেষ পর্ব সেই সময়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা তাদের নিজেদের সুবিধার্থে গদ্য চর্চা রচনা করেছেন।কারণ বিদেশ থেকে আগত যে সমস্ত কর্মচারীরা বাংলা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আসছেন তারা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালীদের আচার-আচারণ সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। তাই তারা এদেশীয়দের দিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করতে শুরু করলেন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে।আবার কিছুক্ষণ মিশনারীরা তারা কি তাদের বাইবেল কে বাংলায় অনুবাদ করে ধর্ম প্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।ফলে তারাও তাদের গ্রন্থ কে বাংলায় অনুবাদ করে বিভিন্ন মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ করে দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে মিশনারীরা নিজেদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে থাকেন ফলে ধীরে ধীরে গদ্য লেখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। পদ্যের পয়ার ত্রিপদী ছন্দে বন্ধন ভেঙে সহজ-সরলভাবে তারা বিভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ করতে শুরু করেন শুরু হয় বাংলা গদ্যের উন্মেষ লগ্ন।

ঊনিশ শতকের বাংলা গদ্যের আরম্ভ হয় বলে একটি সাধারন মত আছে ।এই ধারণার পেছনে যে যুক্তি বর্তমান সেটি হল প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে , মূল বিষয়ের বর্ণনা ছাড়াও কবিতা তখন নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে পেয়ারের সাবলীল ছন্দেই রূপদান করেছেন বিভিন্ন কবিতা

কিন্তু আধুনিক যুগ লেখককে সমাজের নানা সমস্যা সংঘাত ও জীবনযন্ত্রণার জটিল বিষয় প্রকাশ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে গদ্যের মাধ্যমে । আধুনিক গবেষণায় বলা হয়েছে "ষোড়শ শতাব্দী থেকে মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে বাংলা গদ্যের- কাজের গদ্যের এবং ভাবীর নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে কিংবা রাজা রাজাদের লিখিত দলিল দস্তাবেজ এর লিখিত বিষয়বস্তুতে তখন লক্ষ করা যায়।১৫৫৫ সালে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ন ভূপের একখানি পত্র বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকগণের কিছু রচনায় বাংলা গদ্যে নিদর্শন পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে সরকারি কাজে ব্যবহৃত দলিল-দস্তাবেজ রেকর্ড ইত্যাদি ছাড়াও ব্যক্তিগত পত্র দলিল চুক্তিপত্র আরজি ইত্যাদিতে বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকে নেপালে প্রাপ্ত বংশ মন ওঝা রচিত নাটক এছাড়া বিভিন্ন পুস্তকেও বাংলা গদ্যের নিদর্শন মেলে।